Vol. 47 | No. 2 | 2006

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

নদী ও নারী : জীবন চিত্র

Volume	47
Issue	2
Year	2006
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ
Published online	February 1, 2006
DOI	10.62328/sp.v47i2.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v47i2.4
Pages	65-85
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

নদী ও নারী : জীবন চিত্র

মোহাম্মদ তাজুদ্দিন আহম্মেদ*

পদ্মা নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন বাস্তবতা অবলম্বনে হুমায়ুন কবির (১৯০৬-১৯৬৯) 'নদী ও নারী' উপন্যাস (১৯৪৫) রচনা করেন। নদীপ্রবাহ জীবনপ্রবাহ ও সময়প্রবাহকে একীভূত করে জীবনের সমগ্রতা নির্মাণের প্রচেষ্টাধন্য এ উপন্যাস।[১] নদীর গতিশীল প্রবাহ পথে ভাঙনে ঝড়–জলোচ্ছ্বাসে নদী তীরবর্তী মানুষেরা হয় বিপন্ন। আবার তারা সে নদীর বুকে জেগে ওঠা পলল তীরেই ঘরবাড়ি তৈরি করে নতুন জীবনের স্বপ্ন বোনে। নদীর এ দ্বিমাত্রিক আচরণের অধীন মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও সফলতা-ব্যর্থতার ছবি ·এ উপন্যাস। উপন্যাসের বিশাল ভৌগোলিক ক্যানভাসের মানুষেরা পদ্মার প্রমত্ততার কাছে যেমন পরাভূত, তেমনি তারা পদ্মার ওপর নির্ভরশীলও। 'নদী এখানে কেবল বিনাশী শক্তি নয়, প্রাণদায়িনীও বটে'।[২] পদ্মার প্রচণ্ড বৈরিতার বিরুদ্ধে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে সংগ্রামশীল জীবনসন্ধানী নজুমিয়া, আসগর ও মালেক। এ তিনটি প্রধান চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'নদীং ও নারী'। এখানে মাটি, নদী ও নারীর ঐক্যসূত্রে সামষ্টিক জীবনের অস্তিত্ব ঘোষিত হয়েছে। যথাক্রমে নজুমিয়া, আসগর, নূরু ও মালেক নামে তিন খণ্ডের উপন্যাসে অন্ত র্ভুক্ত চরিত্রদের জীবন যুদ্ধই এ উপন্যাসের বিষয়। নজুমিয়ার আশা-নিরাশা তথা জীবন সংগ্রাম পরিকল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে পদ্মা তীরবর্তী মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার প্রকৃত প্রয়াস। এ উপন্যাস সম্পর্কে একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন :

> পদ্মার নিষ্ঠুর বৈরিতার বিরুদ্ধে তীরবর্তী মানুষেরা মাথা তুলে দাঁড়াতে চায়, আপন অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়াস পায়; কিন্তু নির্মম পদ্মা, গ্রিক-ট্রাজেডির অমোঘ নিয়তির মতো, মানুষের স্বপ্নকে দেয় ভেঙে।[৩]

তবু এ পদ্মার প্রতিবেশী সংগ্রামী আর স্বাপ্নিক নজুমিয়া-আসগর-বসির-মালেক-কুলসুম- নূরুসহ কেউ-ই মাথা নত করে না পদ্মার প্রমত্ততার কাছে। পদ্মার ভাঙনে সর্বস্বান্ত হয়েও আবার তারা আশায় বুক বাঁধে, পাড়ি দেয় সুদূর পদ্মায় ভেসে ওঠা অন্য কোন স্বপ্নময়ী দ্বীপে।

পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে নজুমিয়া তার অতীত দরিদ্র জীবনের কথা মনে করে। বিদেশী বিত্তহীন দারিদ্র্যপীড়িত নজুমিয়া ভাগ্যান্বেষণে এসেছিলো পদ্মার তীরে। সে

---

* পিএইচ.ডি গবেষক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জেনেছিলো, পদ্মার তীরে জমি পাওয়া যায়। সে জমি আবাদ করে ফসল ফলিয়ে ভালোভাবে জীবন ধারণ করা যায়। নজুমিয়া পদ্মার চড়ায় গিয়ে আশ্রয় পায় সর্দার রহিম বখসের কাছে। রহিম বখস পদ্মার তীরের সব কৃষককে ভালো-মন্দের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়। তার ভাবনা জীবনমুখী। সে সকলের বাসস্থানের কথা ভাবে, প্রত্যেকের ফসল ফলানোর কথা চিন্তা করে। সর্দার সবার জন্যে নির্দেশ দিয়েছে, সামর্থ্য অর্জন না করে কেউ বিয়ে করতে পারবে না। জমি ও স্ত্রী একত্রে বশে আনা যায় না বলে সর্দারের ধারণা। জঙ্গল পরিষ্কার করে জমি চাষের উপযুক্ত করে তুলতে শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, সংগ্রাম ও সাধনার দরকার। সে জন্য ভুলতে হবে স্ত্রীর ভাবনা । নজুমিয়া নিজের জীবনের উন্নতির জন্যে সর্দারের নির্দেশ মেনে নিয়েছে। জীবনের প্রতি নজুমিয়ার ছিল অপরিসীম মমতা। অর্থ-সম্পদ উপার্জনের তাগিদ নজুমিয়াকে উৎসাহিত করেছিল হাড়-ভাঙা পরিশ্রম করতে। জঙ্গল কেটে আবাদ করলে দু তিন গুণ ফসল পাওয়া যায়। বর্ষার সময় আউশ ধান আর চৈত্র-বৈশাখে চৈতালী ফসল পাওয়া যায়। এ ফসল ফলাতে চাই পরিশ্রম। পরিশ্রম করেই নজুমিয়া সর্দারের আশীর্বাদ লাভ করেছে। দরিদ্র, সর্বস্বান্ত নজুমিয়ার ভাগ্যের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তাতে মূল সহায়তা মিলেছে সর্দারের কাছ থেকে। নজুমিয়ার সংগ্রামশীলতা তীব্র আন্তরিকতাপূর্ণ। তাই এক জোড়া গরু দিয়ে পালাক্রমে সবাই জমি চাষ করে। কিন্তু সমস্যার হয় না সমাধান। চাষের ক্ষেত্রে এ সীমাবদ্ধতা দূর করতে নজুমিয়া বন্ধু আসগরের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজেরাই জোয়াল কাঁধে তুলে নেয়। তাদের এ সাফল্যে স্থানীয় সবাই আশ্চর্যন্বিত হয়। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> বুড়োর দলকে তাজ্জব বানিয়ে হালে কাঁধ দিল নজুমিয়া আর আসগর, দেখাদেখি আরো কয়েকজন শুরু করে দিল। বলদের অভাবে তাদের চাষ আর ঠেকে থাকবে না।[৪]

এমন বাস্তব ও জীবনমুখী সংগ্রামের জন্যেই নজুমিয়া আর্থিক ও সামাজিক সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়। পদ্মার তীরে দাঁড়িয়ে নজুমিয়ার অতীত স্মৃতি রোমন্থনের মাধ্যমে পদ্মার তীরবাসীদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়েছে, এবং এ পটভূমিতে নির্মিত হয়েছে এ উপন্যাসটি। এই প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> নদী ও নারী, ভিটে ছাড়া জমিহীন গতরসর্বস্ব ক্ষেতমজুরের জীবন সংগামের কাহিনী, প্রকৃতিকে জয় করার কাহিনী।[৫]

প্রকৃতিকে জয় করতে গিয়ে নদী ও মানুষ যেন হয়েছে একাত্ম। এবং জীবন সংগ্রামের নানা পরিচয়ে সফলতা-ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তা প্রতিফলিত হয়েছে এ গ্রন্থে। হত দরিদ্র ক্ষেতমজুরেরা শ্রম দিয়ে দিনে দিনে প্রকৃতিকে যেন করেছে জয়। নদী, খাল প্রভৃতিকে পরম আত্মীয় ভেবে তার কোল ঘেঁষে নজুমিয়া গড়েছে নিজের দহলিজ। উপন্যাসে নজুমিয়ার ঘরবাড়ি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> বড় নদীর বাঁকের মুখ থেকে বেরিয়েছে উজান ডাঙ্গার খাল। সেই খালের কোলে নদীকে আঁকড়ে ধরে নজুমিয়ার দহলিজ।[৬]

নজু মিয়ার ঘরটি মাটির তৈরি হলেও ঘর, উঠান, বাড়ির আনাচে-কানাচে সব জায়গায় রয়েছে পরিচ্ছন্নতার ছাপ। নজুমিয়ার বৃদ্ধা মা আয়েষা এ বাড়ির ভেতরকার সব কাজ দেখাশোনা করে। নজুমিয়া তার কর্মকাণ্ডে মেনে চলে তার মায়ের পরামর্শ। বাড়ির মধ্যে কাজের লোক কুলসুম ও গোলাপীকে নিয়ে আয়েষা সংসারের কাজকর্ম করে। বাড়ির মধ্যে সে পাট খড়ির বেড়া দিয়ে পর্দার ব্যবস্থা করেছে। আয়েষা ধর্মভীরু নারী। মায়ের প্রতি নজুমিয়ার শ্রদ্ধা ভক্তির কমতি নেই। তবু মা ও সন্তানের মধ্যে ঘটে মান-অভিমান মালেককে বিয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে। নাবালক মালেককে নজুমিয়া বিয়ে দিতে নারাজ। কিন্তু আয়েষার ইচ্ছা ভিন্ন। সে নাতবৌ ঘরে এনে আমোদ-আহ্লাদ করবে, তারপর তাকে বুঝিয়ে দেবে সংসারের দায়-দায়িত্ব। আয়েষা এভাবেই খোঁজ করে তার সুখের ঠিকানা। আয়েষা যুক্তি দিয়ে নজুমিয়াকে বোঝাতে চায় এবং বলে :

> কচি বয়সে এক ফুটফুটে বউ আনবো, তাকে নিয়ে একটু আমোদ আহ্লাদ করব, নিজের হাতে তাকে মনের মত তৈরি করে নেব।[৭]

নাতি সম্পর্কে আয়েষার অতিরিক্ত উৎসাহকে নজুমিয়া প্রশ্রয় দেয় নি। সংসার পরিচালনায় কর্মঠ ও দায়িত্বশীল হয়েও সমাজ বা জীবন সচেতন হতে পারে নি আয়েষা। মালেকের প্রতি তার যেমন রয়েছে স্নেহ-মমতা মালেকেরও তেমনি দাদীর ওপর রয়েছে ভক্তি ও আবদারের অধিকার। সে কারণেই মালেক বড়শিতে শিকার গেঁথে ছুটে গেছে দাদীর কাছে। ইদ্রিস কোনভাবেই ছিপ টেনে তুলতে পারছে না। গ্রামের সব লোকই এর মধ্যে এসেছে নদীর ঘাটে। নজুমিয়ার ভক্তরা অনেকেই ছিপ টেনে তুলতে চেয়েছে, কিন্তু সে কারো হাতে একক দায়িত্ব দেয় নি। কারণ মালেকের কারণে গ্রামের কোন মানুষের যদি ক্ষতি হয় তা হলে নজুমিয়াই যেন দায়ী হয়ে যাবে। পঞ্চায়েত পদে নজুমিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগর তা হলে চারিদিকে বদনাম ছড়াবে। আসগর মিয়ার ষড়যন্ত্রের সে পথ বন্ধ করার জন্যে নজুমিয়া নিজেই নৌকা নিয়ে শিকার তুলতে নদীতে যায়। দলবদ্ধভাবে নদীর তীরবর্তী মানুষের জীবন যাপনের নানা প্রতিকূলতার প্রতীক মালেকের কুমির শিকার। তাদের জীবনের অসংখ্য বিরূপ অবস্থা সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেছেন:

> শুধু নদী আর জমিকেই বশ করতে হয়নি তাদের আরও প্রতিকূলতার সঙ্গে যুঝতে হয়েছে। .... যে প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে ঐ মানুষগুলোকে বাঁচতে হয়েছে কুমির শিকারতো তারই প্রতীক।[৮]

আয়েষার বক্তব্যে অবশ্য প্রকাশ পায় গভীর মমতা; সে বলে, 'দাদুর ধরা প্রথম কুমির'[৯]। মালেকের এ শিকার তার জীবনের প্রথম সাফল্য; যেন সে আগামীতেও

জীবনসংগ্রামে অংশ নিয়ে জয়ী হবে সব জায়গায়। 'প্রথম কুমির' বলার মাধ্যমে আয়েষা যেন মালেকের আরও কুমির শিকারের কথাই বলতে চেয়েছে।

মালেকের কুমির শিকারের খবর ছড়িয়ে যায় চারদিকে। বিশেষ করে ধূলদীর হাটেই এ খবর গুরুত্বসহ প্রচার পায়। ধূলদীর হাট যেন রহিমপুরের মানুষের প্রাণকেন্দ্র। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য-সামগ্রী কেনাবেচার জন্যে সবাই এখানে জমায়েত হয়। ক্রমে ক্রমে ধূলদীর হাট স্থানীয় জনজীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। গ্রামের মানুষের উপস্থিতিতে নিত্যদিনের খবরাখবর সহজেই এখানে এসে পৌঁছে যায়। বিয়ে ঠিক করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজও এ হাটের মধ্যে আলাপ আলোচনায় সুসম্পন্ন হয়। এ ভাবেই এ হাটে পৌঁছেছে মালেকের কুমির শিকারের খবর। নজুমিয়া হাটের সীমানায় যেতে যেতেই এ প্রসঙ্গে নানা কথাবার্তার সম্মুখীন হয়। অবশেষে নজুমিয়া হেকিম সাহেবের কাছে আটকে পড়ে। নজুমিয়া অবশ্য কোন সাহায্য করতে পারে নি হেকিম সাহেবকে। কারণ ইতোমধ্যেই নদীতে ফেলে দেওয়া হয়েছে কুমিরের কলিজা, গুর্দা প্রভৃতি। ফলে দুষ্প্রাপ্য ঔষধ তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তিনি। হেকিম একদিকে নজুমিয়াকে তোষামোদ করেছে, অন্যদিকে নদীতে চলে গেছে কুমিরের গুর্দা কলিজা। সে জন্যে হেকিম সাহেব হয়েছেন মর্মাহত যেন তাঁর জাত্যাভিমান হয়েছে আহত। হেকিম সাহেব নিজেকে সমাজের অভিজাত শ্রেণীর লোক বলে মনে করেন। এবং সে দৃষ্টিতেই তিনি নজুমিয়াকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রয়াসী হয়েছেন। পক্ষান্তরে হেকিম সাহেবের ডাক্তারির দৌরাত্ম্যের কথা ভাবলে তাঁকেই বরং নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ধরে নিতে হয়। তার ডাক্তারি শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> দরজিপাড়ার এক ছেলে পালিয়ে পশ্চিমে গিয়েছিল, সেখানে গিয়ে হিন্দুস্তানী বকুনী আর দু'চারটা দাওয়াইয়ের নাম শিখেছে, আজ তারই জোরে সে হাকিম সাহেব। কেউ বলে হিন্দুস্তান ফিন্দুস্তানতো দূরের কথা, বাঙালামুলুকের বাইরে কোনদিন পা বাড়ায় নি। তবে নাপিতের ছেলে, চালাক-চতুর, এক বিদেশী হাকিমের তলপী বয়েছিল বছরখানেক, সেই তার বিদ্যার দৌড়।[১০]

এ রকম তথাকথিত স্বশিক্ষিত হেকিমের চরিত্রটি আমাদের সমাজ বাস্তবতারই এক ছবি। গ্রাম বাংলার হাটে-বাজারে-বন্দরে এ রকম হাতুড়ে হেকিম দেখা যায়। উন্নত শিক্ষা ও রুচির ধারেকাছেও নেই তিনি। তার কথা ও আচরণ তাই স্থূলতারই নামান্তর। তার প্রত্যাশিত কুমিরের গুর্দা, কলিজা না পাওয়ায় হেকিম তাই বেসামাল কথা বলে বসেন নজুমিয়াকে :

> তা জুতো পরতে যদি এতই কষ্ট, তবে ভদ্দর লোকের ফরাসে বসার সখ কেন? আর বসতে হলেও অন্ততঃ পা দুটো তো ধুয়ে নেওয়া যায়।[১১]

হেকিমের এ অবমাননাকর কথায় 'পঞ্চায়েত' নজুমিয়া রাগন্বিত; কিন্তু সে তা প্রকাশ করে নি। সে বরং ভেবেছে , নিজেই মারামারিতে জড়িয়ে পড়লে সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং তার ভাবমূর্তি হবে ক্ষুণ্ন। সে কারণে সে অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞ পঞ্চায়েতের মতোই জবাব দিয়েছে :

> আমরা চাষী-- চাষীর ছেলে ভদ্দর লোকের রেওয়াজ জানি না। ঘরে ডেকে এনে মানুষকে অপমান করাই বোধ হয় আপনাদের মতন ভদ্দর লোকের ব্যবহার।[১২]

পঞ্চায়েত ব্যবস্থা নজুমিয়াদের ক্ষমতার এক উৎস। এবং চাষাবাদ করে আর্থিক মান বজায় রেখে জীবন যাপনের বুদ্ধি তাদের কারও চেয়ে কম নয়। তাদের কোন প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা না থাকলেও নেই বুদ্ধির কোন ঘাটতি; চালাক-চতুরও কম নয়। সে খবর অবশ্য জানা নেই হেকিম সাহেবদের। সে কারণেই হেকিম সাহেব পঞ্চায়েত নজুমিয়ার সঙ্গে এমন নীচ আচরণ করতে সাহসী হয়েছেন। অপমানিত ও ক্ষুব্ধ নজুমিয়া হেকিমের কাছ থেকে তার মায়ের জন্যে ব্যথার মালিশ না নিয়েই ফিরে আসে তার নৌকায়। এ দিকে আর এক ঝামেলা পাকিয়ে বসে তার কামলা রমজান। ধান কাটার জন্যে কিষাণ না নিলে দু' এক দিনের মধ্যেই ফসলের ক্ষতি হবে। অথচ বেশি মজুরি চায় বলে কিষাণদের ভাড়া করে নি রমজান। ফলে তারা চলে গেছে আসগর মিয়ার নৌকায়। আসগর মিয়া নজুমিয়ার জানের শত্রু। এই ঘটনায় সঙ্গত কারণেই আহত ও ক্ষুব্ধ নজুমিয়া। এই হাটেই যে এ ভণ্ড ফকিরের আস্তানা গড়ে ওঠে, তা সমাজ বাস্তবতারই একটি চিত্র। ফকিরকে কেন্দ্র করেও নজুমিয়া ও আসগর মিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পরিবেশ তৈরি হয়। বাংলাদেশে ফকিরের চিকিৎসা অব্যর্থ বলে প্রায়ই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণা চলে এবং লোকেরা তা বিশ্বাসও করে। ধর্ম ও সংস্কারের প্রভাবেই এমনটি ঘটে। ধূনেদীর হাটে দুই চিকিৎসকের বসবাস; হেকিম ও ফকির দু জনই হাতুড়ে ও ভণ্ড। তবু, ঔষধ ও ফিকির নিতে আসা মানুষেরা সব সময়ই ভীড় করে থাকে, গ্রামের অজ্ঞ-অশিক্ষিত মানুষই হয় এ ধরনের চিকিৎসকের রোগী। ধূলদীর হাটের অশিক্ষিত মানুষেরা তাই সহজেই মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে হেকিম-ফকিরের । নজুমিয়াও ফকিরের দাওয়াত পেয়ে সেখানে উপস্থিত না হয়ে পারে নি। আসগর মিয়াও এসেছে একই ফকিরের কাছে। এখানেই দুজনে সামনা-সামনি হয়ে পড়লে নিমিষেই উপস্থিত মানুষের মধ্যে দুটি পক্ষের সৃষ্টি হয়। দলগত আনুগত্যের পরিচয় পাওয়া যায় উপস্থিত মানুষের মধ্যে দুটি পক্ষ তৈরি হওয়ায়। সবচেয়ে উলেখযোগ্য বিষয় হলো, এ সমাজের বহিরঙ্গে নজুমিয়া বা আসগর মিয়ার আধিপত্য থাকলেও অন্তরঙ্গে রয়েছে ছদ্মবেশী হেকিম, ফকির। নজুমিয়া ও আসগর মিয়ার মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলে কে কিভাবে হেকিম-ফকিরের প্রিয়ভাজন হবে। সেহেতু ধরে নেওয়া যায় যে, অজ্ঞতা তাদের জীবনে তথা সমাজের একেবারে গভীরে প্রোথিত। তাই, গভীর আস্থার

ভিত্তিতেই ছয় সন্তান ও স্ত্রী হারানো হামদু চাচা ফকিরের কাছে দাওয়াই চায়। তার ধারণা, ফকিরের দাওয়াই সেবন করলে সে ফিরে পাবে তার স্ত্রী-সন্তান। অসম্ভবকে সম্ভব করার ক্ষমতা রয়েছে ফকিরের, হামদু-চাচার এ ধরনের অবাস্তব বিশ্বাসের ভিত্তি হলো অশিক্ষা-কুশিক্ষায় ভরা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মনের কুসংস্কার। বলা বাহুল্য, এ ধরনের সমাজেই হেকিম-ফকিররা তাদের ব্যবসা ভালোই জমিয়ে বসে।

ধূলদীরহাটে নজুমিয়ার সঙ্গে হেকিম-ফকির-আসগর মিয়া সবার ঝগড়া হয়। এ ঝগড়ার কথা নজুমিয়া তার সঙ্গী রমজান, বসিরকে আয়েষার কাছে গোপন করতে বললেও আয়েশা তা রমজানের কাছ থেকে জেনে নেয় কৌশলে। ধর্মভীরু আয়েষার ফকিরের ওপর খুব বিশ্বাস। তার ধারণা, ফকিরদের অভিশাপ-আর্শীবাদ সহজেই কাজে লাগে। আয়েষা নজুমিয়াকে তাই পদ্মার ওপারে যেতে দেয় না। ভরা পদ্মায় ভাদ্র মাসে তুফান ওঠে, ফকিরের কাছে মাফ চেয়ে তাকে সন্তুষ্ট না করে পদ্মা পাড়ি দিলে বিপদ হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা-এমনই ভাবে আয়েষা। কিন্তু পদ্মার ওপারে নজুমিয়াকে যেতেই হবে। কারণ, পদ্মার বুকে চর জেগেছে; জেগে ওঠা নতুন চরে জমি দখল নিতে হবে নজুমিয়ার। নতুন চরে জমি দখল নিতে ব্যর্থ হলে নজুমিয়া হেরে যাবে তার প্রতিদ্বন্দ্বী আসগর মিয়ার কাছে। কিন্তু কোনমতেই আয়েষা নজুমিয়াকে পদ্মার ওপারে যেতে দিতে রাজি না। অবশেষে নজুমিয়া আয়েষাকে কথা দিয়েছে, ফিরে এসে ফকিরকে বাড়িতে দাওয়াত দিয়ে খাওয়াবে এবং মিলাদ পড়াবে। চর দখল সম্পর্কে নজুমিয়া আয়েষাকে বুঝিয়েছে, ছেলে মালেকের ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলেছে :

> তুমি কি চাও যে তোমার মালেক আসগরের ছেলেপুলের কাছে মাথা নীচু করে থাকবে ? [১৩]

আয়েষা নজুমিয়ার বাস্তব অবস্থা বুঝতে পারে নি। সে অমূলক একটা আতঙ্কে, সন্তানের অমঙ্গলের দুর্ভাবনায় অস্থির। কিন্তু নজুমিয়ার বাস্তবতা ভিন্ন। আসগরের কাছে হেরে যাওয়ার অর্থ নজুমিয়ার অস্তিত্বের বিপর্যয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রতিযোগিতা সবখানেই কমবেশি লক্ষ্য করা যায়। তবে, চর দখল নিয়ে অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটে নি। পুবের চর অনেক দিন টিকে থাকে বলে বসিরের পরামর্শে পূর্বের চরই দখল করেছে তারা। নতুন চর দখল করে নজুমিয়া বাড়ি ফিরছে। বাড়িতে ফসল তুলে সবকিছু গোছগাছ করে সে যায় ধূলদীরহাট, ফকিরকে দাওয়াত দিতে। ততদিনে ফকিরের আস্তানার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে । এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> বটগাছের চেহারা একেবারে ফিরে গেছে। গতবার যখন এসেছিল তখন সামান্য একটু ঝোপড়া, এখন বটগাছ ঘেরাও করে মস্তবড় চালাঘর, নতুন বাঁশের বেড়া চকচক করছে। ঘরের উপরে মস্তবড় সবুজ নিশান।[১৪]

কুসংস্কার রাজত্ব করে এ ভাবেই। ফলে, অশিক্ষিত ও বাস্তবতাবোধশূন্য সমাজে ফকির তথা ধর্মব্যবসায়ীদের উন্নতি হয় শনৈঃ শনৈঃ। সমাজের গভীরে প্রোথিত এই অশিক্ষা-কুশিক্ষার প্রভাব শিক্ষা ও বিজ্ঞান-চেতনার প্রসারে দূর হতে পারতো। কিন্তু তার আপাত কোন সম্ভাবনা নেই। কারণ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার প্রসার চলছে অতি ধীর গতিতে। ফলে, পীর ফকিরদের ধর্ম ব্যবসা অপ্রতিহতই রয়ে যাচ্ছে। এই পটভূমিতে যে ধর্মশিক্ষা প্রচলিত তা-ও সম্পূর্ণ অন্ধত্বের মধ্যে নিপতিত। নজুমিয়া ছাত্রদের পড়তে থাকা কোরাণের অর্থ জানতে চাইলে তারা অবলীলাক্রমে জানায় :

> খোদার কালাম পড়ছি, হেফজ করে মুখস্থ করছি, তার আবার মানের কথা ভাবে কে? [১৫]

তাদের কোরান পড়ার এ পদ্ধতি বহুকাল ধরেই চলে আসছে। লেখক তার-ই প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন এখানে। নজুমিয়ার এই জিজ্ঞাসায় জানা তথ্যটি বেরিয়ে এসেছে পুনরায়। নজুমিয়া মূর্খ হলেও বুদ্ধিমান। সে ফকিরের ভণ্ডামি ও কেরামতি বুঝতে পারে ভালোভাবেই। তারপরও তাকে প্রায় বিনা কারণে ফকিরের কাছে মাফ চেয়ে তাকে বাড়িতে খাওয়ার জন্যে দাওয়াত করতে হয়। আসন্ন কার্তিকের পূর্ণিমা রাতে ফকির নজুমিয়ার বাড়িতে ওয়াজ করবে। এই উপলক্ষে সে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে তার বাড়ি দাওয়াত করেছে। পাঁচশ মানুষকে সে খাওয়াবে। এক মঞ্চে এত মানুষের খাওয়ার জন্যে সে আমলে বাসন পাওয়া ছিল কঠিন। সে কারণেই হয়তো সেকালে বড় ধরনের যে কোন অনুষ্ঠানে খাবার পরিবেশন করা হতো কলা পাতায়। তবে ছোঁয়াছুঁয়ির ক্ষেত্রে মুক্ত হওয়ার জন্যেও পাতা ব্যবহার করা হতো। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> গাদা গাদা কলাপাতা কাটা হলো, তা নইলে এত লোকের জন্য বাসন মিলবে কোথায়? [১৬]

এই মিলাদকে কেন্দ্র করে নজুমিয়ার বাড়ি উৎসব মুখর হয়ে ওঠে। ফকিরের বসার জন্যে তাকিয়া পাতা, তার ওপর সামিয়ানা টাঙিয়ে তার নিচে অতিথিদের বসার ব্যবস্থা ইত্যাদি। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষার জন্যে আতরদান, গোলাবদানসহ আগরবাতি জ্বালানো হয়। এ সবের মধ্য দিয়ে পদ্মা তীরবাসী মানুষদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের একটি চিত্র পাওয়া যায়। উক্ত অনুষ্ঠানে ফকির সাহেব কোরান পড়ছেন কিন্তু কেউ তার অর্থ বোঝে না। বাংলায় অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার কোন রেওয়াজ নেই। ভক্তিই এখানে প্রধান প্রবণতা :

> সবাই জানে খোদার কালাম, ভক্তিতে শ্রদ্ধায় তাদের মন পরিপ্লুত।[১৭]

এ ধরনের পরিবেশে ফকির সাহেব ইসলামের নানা বিষয়ে বক্তব্য রেখেছে তার নিজের মতো করেই। এক্ষেত্রে তাকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। তাতে দ্রুত ধর্মভীরু

মানুষেরা ফকিরকে বিশ্বাস করে। ফকিরের জ্বিন ছাড়ানোর কারদানি তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করে তোলে। তারা অবশ্য ফকির কর্তৃক রোগীকে প্রচণ্ড প্রহারের বিষয়টি লক্ষ্য করে নি। তারা কেবল যেটা আমলে আনলো সেটি হলো, ফকির কেরামতির সাহায্য ঝাড় ফুঁক দিয়ে ইব্রাহিমের মেয়েকে জ্বিনের কবল থেকে মুক্ত করলো। এ প্রসঙ্গে লেখক উপন্যাসে উল্লেখ করেছেন :

> দাঁত দিয়ে কলস তুলে সাত পা হেঁটে গেল। তারপর বেহুঁস হয়ে মাটিতে পড়ে গেল, কলস ভেঙে জলে সমস্ত দেহ ভিজে গেল, সেই জলের মধ্যেই সে পড়ে রইলো।[১৮]

কারও ওপর জ্বিনের আছর এবং পীর-ফকিরের সাহায্যে তা ছাড়ানোর মহড়া আমাদের গ্রামে প্রায়ই দেখা যায়। কিন্তু সবাই যে তা বিশ্বাস করে এমন নয়। অশিক্ষা ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন লোকজনদের পাশেই ফকির ও ওঝারা তাদের কেরামতি দেখায়।

নজুমিয়ার বাড়িতে জিয়াফত শেষে নজুমিয়ার সুনাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও তার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব পালন করা হয় নি। পদ্মার ওপারে বিলি করা জমির খাজনা তুলেই সে জমিদারের পাওনা মিটিয়ে দেবে। কিন্তু পদ্মার রূপ দিনে দিনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে; যে কোন সময় ফুঁসে উঠতে পারে। সে যখন তখন ভাসিয়ে নিতে পারে জীবন ও জনপদ। বয়স্ক আয়েষা দীর্ঘদিন দেখেছে পদ্মার চরিত্র। সে বুঝতে পারে, কখন পদ্মা হয়ে ওঠে প্রলয়ংকরী। পদ্মার ভয়াবহ রূপ দেখে আয়েষা নজুমিয়াকে নদীতে যেতে দিবে না; কিন্তু নদীর ওপারে বিলি করা জমির খাজনা সংগ্রহ করে জমিদারকে তার পাওনা মেটাতে হবে। ধূলদীর হাটে জমিদারের পাওনা মেটাতে না পারলে সমূহ বিপদ। তাই অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে, মায়ের নিষেধ সত্ত্বেও, নজুমিয়াকে নিরুপায় হয়ে পদ্মা পাড়ি দিতেই হবে। এই বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হয়ে নজুমিয়া বসির, ইদ্রিস ও রমজানকে সঙ্গে নিয়ে পদ্মা পাড়ি দিতে রওয়ানা হয়; কিন্তু প্রকৃতি নিষ্ঠুর খেলায় মেতে ওঠে, প্রচণ্ড ঝড়-তুফানে পদ্মা হয়ে ওঠে প্রাণ সংহারী। প্রমত্ত পদ্মার সে রূপ সম্পর্কে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> তিনজনে বৈঠা হাতে নৌকা বাঁচাবার শেষ চেষ্টা করতে লাগলো। নদীর প্রচণ্ড ঢেউএ নৌকার দুপাশ থেকে জল উঠতে শুরু করলো। নজুমিয়া বলল, বৈঠা ছেড়ো না। যদি নৌকা ডোবেও, বৈঠা ধ'রে হয়তো কোন চরে গিয়ে উঠতে পারবো।
>
> তাকে ব্যঙ্গ করেই যেন বাতাসের গর্জ্জন আরও তীব্র হয়ে উঠলো। বিরাট এক ঢেউয়ের মাথায় নৌকা যেন আকাশের দিকে ফুলে উঠল, পর মুহূর্ত্তেই নৌকা আবার পাতালে নেমে গেল। যখন ঢেউ ভাঙলো তখন নৌকার আর কোন চিহ্ন নাই।[১৯]

শেষ পর্যন্ত আয়েষার আশঙ্কাই সত্যি হলো। অনেক স্বপ্ন নিয়ে একদিন নজুমিয়া এই পদ্মার তীরে এসে দাঁড়িয়েছিল ; সর্দার রহিম বখসের সহায়তা নিয়ে সে তার

আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। পদ্মার অপার কৃপায় সে পেয়েছিলো সুখ-সমৃদ্ধি। আবার সেই পদ্মারই নির্মম বৈরিতায় তাকে প্রাণ দিয়েই যে ঋণ পরিশোধ করতে হলো। নজুমিয়ার সঙ্গী মাঝিদের মধ্যে ইদ্রিস ও রমজান জীবন্ত ফিরতে পারে নি। শুধু অভিজ্ঞ মাঝি বসির মৃতপ্রায় অবস্থায় জেলেদের সাহায্যে উদ্ধার পায়। এ নির্মম সংবাদে ধূলদীবাসী মানুষদের মধ্যে শোকের ছায়া নামে। গভীরভাবে মর্মাহত, শোকাহত হয় নজুমিয়ার মা আয়েষা।

নজুমিয়ার মৃত্যু এক গভীর সংকট তৈরি করে আয়েষা ও মালেকের জীবনে। গোলাপী, কুলসুম ও বসির অনিশ্চিত অবস্থায় মধ্যে পড়ে যায়। নজুমিয়ার সম্পত্তি ও সংসার রক্ষা করা আয়েষার পক্ষে হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য। সে পুত্র শোকে দিন দিন হয়ে ওঠে পাগল প্রায়। তার দুশ্চিন্তা মালেককে নিয়ে, গভীর দুঃখ ও হতাশা নিয়ে আয়েষা বলে :

> কে তোকে এখন দেখবে–কে বিপদে আপদে পাহারা দেবে ? হাট থেকে তোর জন্যে ভাল গামছা, লাল পিরাণ কিনে দেবে কে? পদ্মার দুকূল ছাপিয়ে বছর বছর জোয়ার ভাটা ফিরে আসবে, কিন্তু তোর বাবাতো আর ফিরবে না।[২০]

আয়েষা প্রতিদিন সন্ধ্যা হলেই নদীর ধারে ছুটে যায়, নদী পথে তার ছেলে নজুমিয়ার ফেরার আশায়। অপেক্ষা ও হতাশায় ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে পড়ে সে। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

> জীবন্ত অথচ যেন প্রাণের সাড়া নেই, জাগ্রত কিন্তু জাগরণের কোনও লক্ষণ নেই–এরকম জীবমৃত্যু যে মরণের চেয়েও ভয়ঙ্কর।[২১]

এ সময় দাদী ও নাতির দিন কাটে দুঃখে ও নিরানন্দে। আয়েষার মাথার চুল সাদা হয়ে যায় সাত দিনের মধ্যে। সে একমাত্র নদীর ঘাটে গিয়েই স্বস্তি পেত। সে জন্যে সব সময় সে ছুটে যেত সেখানে। আয়েষার শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় নদীর তীরে মূর্ছা গিয়েই। আয়েষার মৃত্যুতে নজুমিয়ার সংসার ভেঙে যাওয়া আরও সহজ হয়ে ওঠে। নাবালক মালেকের জীবনও হয়ে যায় অনিশ্চিত। কুলসুম ও গোলাপী হয়ে পড়ে নিরাশ্রয়। এমন দুর্দিনে বৃদ্ধ বসির মাঝিকেই সংসারের হাল ধরতে হয়েছিলো। নজুমিয়ার অভাব সবার জীবনকে করে দিয়েছে এলোমেলো। নদী তীরেই নজুমিয়ার সাফল্য, এখানেই তার ভরাডুবি। নদীর এই ভাঙা-গড়ার চিরকালীন স্বভাবের সঙ্গে তাল মিলিয়েই তাদের জীবন। নজুমিয়া এবং সংশিষ্ট সবারই জীবনে নদীর এই প্রভাব বিদ্যমান। শত প্রতিকূলতাকে মনে রেখেই নজুমিয়ার ঐতিহ্য, মালেকের ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে আত্মনিবেদিত হয় বসির। অন্যদিকে ঘরের কাজ করে এবং মালেককে স্নেহ-মমতা দিয়ে লালন-পালন করে কুলসুম ও গোলাপী। ঐ সংসারে এই দুই নারীর

জীবন যে আর নিশ্চিন্ত নয় আগের মতো, তারাও তা বুঝতে পারে। সে জন্যে তাদের দুর্ভাবনা আরও বাড়ে; তারা স্পষ্ট দেখতে পায় সামনের দুঃখময় দিনগুলো। তবু, তাদের জীবন চলতে থাকে এবং একে অপরের সঙ্গে রঙ-তামাশা করা বন্ধ থাকে না। এই দুই গৃহকর্মী নারীর কাছে স্বামী-সংসার অনিবার্যভাবে প্রত্যাশিত; কিন্তু তারা এ ক্ষেত্রে হতে পারে নি কামিয়াব। এই ব্যর্থতার চিত্রের মাধ্যমে লেখক হতদরিদ্র নারীদের অসহায় জীবনের হাহাকারই যেন ফুটিয়ে তুলেছেন প্রকারান্তরে। তাদের বঞ্চিত জীবনে মালেক যেন একটি মরূদ্যান বিশেষ। সেই যেন তাদের ভবিষ্যতের আশ্রয়দাতা, সহায়। কিশোর মালেককে কুলসুমই বেশি আদর করে, মালেকও কুলসুমের কাছেই করে তার আবদার নানা। বসির তাকে তীর ধনুক বানিয়ে দেয়। আপনহারা মালেকের মনে যাতে কোন কষ্ট না হয়, সে জন্যে তারা সদা তৎপর। অবশ্য কিশোর মালেকের দুরন্তপনা মাঝে-মধ্যে অসহনীয় মনে হয়। সে পাড়ার ছেলে নূরু, সাবু ও অন্যান্যদের সঙ্গে খেলা করে, কখনও কখনও ঝগড়া বাধায়, ঝগড়া হয় সাবুর সঙ্গে মালেকের। বস্তুত, মালেক, নুরু, সাবু ও অন্যান্য কিশোরদের দুরন্তপনার বাস্তব চিত্র আঁকা হয়েছে এ উপন্যাসে। বিশেষ করে কিশোরদের স্নান করার দৃশ্যে, একে অপরের শরীরে কাদা ছুঁড়ে মারা, সারা শরীরে কাদা মেখে সঙ সাজা-প্রভৃতি নানান চিত্র আছে গ্রন্থটিতে। দুরন্ত কিশোর সাবু ডুব দিতে দিতে ছড়া কাটে। অন্যেরাও একে অপরের হাত ধরাধরি করে ছড়া কাটতে থাকে সুর করে। ছড়া গানের মাধ্যমে রহিমপুরবাসীর লোক-সংস্কৃতির পরিচয় এখানে পাওয়া যায়। কিশোররা ছড়ায় বলেছে :

ক. এতটুকু পানি
ঝপর জানি।[২২]

খ. এ গাঙে কুমীর নাই
ঝুপুর ঝাপর নেয়ে যাই।[২৩]

নূরু ও মালেক পানিতে নামে নি। কিন্তু সাবু মালেককে ভীতু বলে তিরস্কার করায় সে জিদের মাথায় সাঁতার দিয়ে মাঝ নদীতে যায়। এবং প্রমাণ করে সে ভীতু নয়। নিজের বীরত্ব প্রমাণ করে মালেক তারুণ্যের জয় দেখিয়েছে। বসির নজুমিয়ার সম্পত্তি রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেও যেন ব্যর্থ। জমিদারের খাজনা মেটাতে যে টাকার প্রয়োজন তা প্রজাদের কাছ থেকে পাওয়া যায় না। দিনে দিনে বসির আয়েষার রেখে যাওয়া গহনাও বিক্রি করে জমির খাজনা মেটাতে চেষ্টা করে। এ প্রসঙ্গে বসির বলেছে :

> আম্মাজানের গয়নাঘাটি ত আগেই গেছে। তোমাদেরও যে দু'চারটে রূপোর হাঁসুলি বাজু ছিল, তাও গেছে। সেই থেকে রায়ত প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়ের চেষ্টা করছি।[২৪]

কিন্তু প্রজারা হাটের মধ্যে জানিয়েছে যে, তারা খাজনা দেবে না। এ ব্যাপারে কুলসুম ও গোলাপীর কোন পরামর্শ আশার আলো দেখায় না। বরং তারা পঞ্চায়েতের কাছে না যাওয়ার জন্যে বলেছে বসিরকে। কুলসুম ও গোলাপী পঞ্চায়েত নির্ভর সমাজ ব্যবস্থাকে স্বার্থান্বেষী বলেই মনে করে । এ প্রসঙ্গে গোলাপীর মন্তব্য :

> এসব কেবল ঢং। আসলেতো মাতবররা পঞ্চায়েতের কথায় উঠ্‌বোস করে।[২৫]

শেষ পর্যন্ত নজুমিয়ার সম্পত্তি রক্ষা করা বসিরের জন্যে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তখন কুলসুম, গোলাপী ও বসির ঠিক করে যে, নজুমিয়ার সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব দিতে হবে আসগর মিয়াকে। তার সম্পর্কে বসির বলে :

> তার কোন বেটাছেলে নাই, আছে এক মেয়ে–নুরু : নূরু আর মালেক দুটাতে খুব ভাব, যেন এক বোঁটায় দুটি ফুল। আমার মনে হয় একদিন তাদের বিয়ে হবেই হবে। নিজের জামাইকে কি আর তখন ঠকাতে চাইবে আসগর মিয়া।[২৬]

বসির মালেককে খুঁজতে খুঁজতে মসজিদের সামনে উপস্থিত হয়। গ্রামীণ মসজিদভিত্তিক সমাজে সবাই একই মসজিদে জামাতে নামাজ পড়ে। আসগর মিয়ার দেখা পায় বসির। ওদিকে মালেককে না পেয়ে বাড়ি ফিরে সন্ধ্যার পর লাঠি ও আলো হাতে আবার তাকে খুঁজতে বের হয় বসির। কুলসুম ও গোলাপী তার জন্যে চিন্তায় অস্থির হয়ে ওঠে। পথে বসিরের সঙ্গে দেখা হয় গলু পাগলার। সে ফিসফিস করে বলে বসিরকে :

> কাউকে বলোনা কিন্তু, এপথে যেতে আমার ট্যাক থেকে একটি থলিয়া পড়ে গেছে। না পেলে ভারী লোকসান হবে, তাই সেই থলিয়া খুঁজছি।[২৭]

গলু মিয়ার এ বক্তব্যে তার মৌলিক অভাবের কথাই যেন ধ্বনিত হয়। আমাদের দেশে এ ধরনের অনেক লোকই আছে অনেকই যারা খাদ্যের অভাবে, বাসস্থানের অভাবে কঠোর দারিদ্র্যের পীড়নে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে পরিণত হয়েছে গলু পাগলায়। মালেকের বন্ধু মতিন, সাবু ও অন্যান্য সম্ভাব্য স্থানেও বসির খুঁজে পায় নি মালেককে। কারণ মালেক গিয়েছিল আসগর মিয়ার মেয়ে নূরুর সঙ্গে তার বাড়িতে। রাতে আসগর মিয়া নিজেই কাঁধে করে মালেককে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে যায়। বসির মালেকের ভবিষ্যৎ ও তার জমি-জমা নিয়ে উদ্বিগ্ন। মালেকের ব্যাপারে সাহায্য নিতে সে একদিন উপস্থিত হয় আসগর মিয়ার বাড়িতে। সেখানে সে দেখলো গরু দাগানো দৃশ্য। উপন্যাসে বলা আছে :

> পাঁচ ছয়জন লোক গরুটীকে মাটিতে ফেলে চেপে ধরে আছে, তার পা গুলিও দড়ি দিয়ে বাঁধা। আর বৈদ্য মালসার আগুনে লোহা রাঙিয়ে গরুটীকে দাগা দিচ্ছে।[২৮]

আমাদের কৃষিপ্রধান দেশে চাষাবাদের জন্যে গরু এখনও নির্ভরশীল প্রাণী। গরু অসুস্থ হয়ে পড়লে কৃষকের দুর্ভাবনার শেষ থাকে না। এ সময় কৃষকেরা গরুর রোগ সারাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। সে সময় তাদের একমাত্র ভরসা হাতুড়ে ডাক্তাররা।

মালেক ও তার সম্পত্তি রক্ষার বিষয়ে আসগর মিয়া অনাগ্রহী নয়। কিন্তু নজুমিয়ার সঙ্গে অতীতের ঘটনা তাকে যেন থমকে দিয়েছে। আসগর মিয়া মনে মনে ভাবে, যদি কোন ভাবে মালেকের সম্পত্তি নষ্ট হয়, তাহলে গ্রামের মানুষ ভাববে যে, হাতে পেয়ে আসগর মিয়া পূর্ব শত্রুতার জের মিটিয়েছে। বসির ও আসগর মিয়া অনেক আলাপ-আলোচনা শেষে স্থির করলো, গ্রামের সব মানুষের সামনে মালেকের এ সমস্যা তুলে ধরবে এবং যে কোন লোক মালেকের দায়িত্ব নিতে পারবে। কিন্তু বৈঠকে উপস্থিত কেউ-ই মালেকের দায়িত্ব নিতে রাজি নয়। অবশেষে আসগর মিয়া মালেকের দায়িত্ব গ্রহণ করে গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্যে বলে :

> মালেকের স্বত্ব প্রাণপণে দেখব। যদি ইচ্ছা করে জেনে শুনে কোনদিন তার হকের বিরুদ্ধে কাজ করি, তবে আমার মাথায় যেন বাজ পড়ে। প্রত্যেক বছর বৈশাখী পূর্ণিমায় সকলের সামনে হিসাব দাখিল করব। যদি অন্যায় করি, গাফলতি করি, তবে তোমরা যা শাস্তি মনে আসে তাই দিও। আমি বিনা ওজরে তোমাদের শাসন মাথায় করে নেব।[২৯]

আসগরের সংসারে মালেক যেন ফিরে পায় হারানো বাবা-মার আদর। আগের থেকেই নূরুর সঙ্গে মালেকের ছিল সখ্যতা। আসগরের বাড়িতে মালেকের সঙ্গে কুলসুম ও বসির এসেছে; গোলাপী আসেনি, সে আশ্রয় নিয়েছে তার এক সম্পর্কীয় ভাইয়ের কাছে। কুলসুম মালেকের মায়া ছেড়ে যেতে পারে নি কোথাও। কিন্তু এখানে ক্রমে ক্রমে মালেকের দায়িত্ব, ভালো-মন্দের ভার যেন আসগরের স্ত্রী আমিনা অধিকার করে নেয়। মালেকের প্রতি কুলসুমের স্নেহ পড়ে যায় প্রতিযোগিতার মুখে। এ প্রসঙ্গে কুলসুমের মনের দুঃখ বোঝাতে ঔপন্যাসিক বলেছেন :

> হাঁড়ির মধ্যে বন্ধ সাপের মতন আপন মনে ফুঁসতে থাকে।[৩০]

কুলসুমের এই মাতৃহৃদয়ের প্রতি আমিনার দৃষ্টি পড়েছে। যৌবনে বিধবা নারী কুলসুমের রয়েছে বিয়ের বয়স, তাই তাকে আমিনা বিয়ে, স্বামী-সংসার সন্তানের স্বপ্ন দেখায় এবং আসগর মিয়া বসিরকে বলে কুলসুমের বিয়ের ব্যবস্থা করে। বিয়ের অনুষ্ঠানে বর আজিজ ও তার বন্ধু-বান্ধবের আগমন, আপ্যায়ন, বরকে নানা প্রসঙ্গে লজ্জা দেয়া, রহিমপুরবাসীর সাধারণ জীবনের এক চালচিত্র। আজিজ ও কুসসুমের বিয়ের মধ্য দিয়ে সূচিত হয় কুলসুমের নতুন জীবন। অন্য দিকে মালেককে নিয়ে আমিনা-আসগরও আছে সুখে। কিন্তু একদিন সব স্বাভাবিকতা ভেঙে, রহিমপুরের জনগণের জীবনে নেমে আসে দুর্যোগ। অনাবৃষ্টির কারণে ক্ষেতের ফসল নষ্ট হয়ে যায়, হারিয়ে যায় গাছ-পালার সবুজ রঙ, শুরু হয় চারদিকে শুধু অভাব। অবশেষে দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। আসগর মিয়া পড়ে যায় মহাচিন্তায়। আসগর মিয়া গত বছর মেয়ে বউয়ের গোট হাঁসুলী বিক্রি করে কোনমতে দিন কাটিয়েছে। এক বছরের ফসল ওঠেনি যাদের

ঘরে সে সব ছোট-ছোট গৃহস্তে-রাও তাদের গহনা বেচে খেয়েছে। সে কারণে, গত বছরও গ্রামে চোর ছিলো না। কিন্তু এ বছরের অভাবে চোর বেড়েছে। চোরদের বিরুদ্ধে আসগর মিয়া শক্ত কোন অবস্থান নিতে পারে না। আসগর মিয়া ভাবে:

> যারা আজ চুরি করছে, তারাও এককালে গেরস্ত ছিল, নিজের জমি জমা চাষ করেছে, এখন অনটনে দিশে না পেয়ে পরের হাঁড়িতে হাত দিচ্ছে। তাদের বাড়ীর বউ, বাড়ীর ছেলেমেয়ের দল বনে বাদাড়ে শাকপাতা খুঁজে বেড়াচ্ছে, বন জঙ্গলের ফলমূল যা পাচ্ছে, তাই হাতড়ে নিয়ে আসছে।[৩১]

দুর্ভিক্ষ কবলিত এ রহিমপুরবাসীর করুণ বাস্তবজীবনের উদাহরণ দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন যে, দ্বিতীয় বছর পর্যন্ত মানুষেরা একহাঁড়ি পানিতে এক মুঠ চাল ফুটিয়ে মাড় তৈরি করে খেয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের তৃতীয় বছর তাদের হাতে বাকি নেই কিছু। ঔপন্যাসিক দুর্ভিক্ষের তৃতীয় বছরের দুর্বিষহ অভাব ও যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

> বাসন কোসন বেচতে চায়, ঘরবাড়ি বেচতে চায়, গাই বলদ বেচত চায়, জরু মেয়ে বেচতেও রাজী।[৩২]

কিন্তু কে কিনবে, কিনেই বা কি লাভ? কোথাও খাবার নেই। মানুষের জীবনে নেমে এসেছে হাহাকার। তীব্র এ সংকট কাটিয়ে বাঁচার উপায় একমাত্র বৃষ্টি। বৃষ্টির জন্য তাই নূরু অন্যান্য মেয়েদের নিয়ে পথে পথে বৃষ্টির গান গেয়ে বেড়ায় :

(ক) কচুর পাতায় হলদি,
বৃষ্টি নাম জলদি।[৩৩]

(খ) কচুর পাতায় করমচা
আয় বৃষ্টি নেমে যা।[৩৪]

ছড়ার গানের মাধ্যমে বৃষ্টি প্রত্যাশা প্রাচীন গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় বহন করলেও আসগর মিয়া তা বিশ্বাস করে না। সে কারণে, নূরুর ওপর সে রাগ করে এবং ভাবে বৃষ্টি হলে গত তিন বছরেই হতে পারত। এখন আর কোন তুকতাকে কাজ হবে না। কিন্তু আসগর মিয়ার এ ধারণা ভুল প্রমাণিত হলো। এবং অঝোর ধারায় নামলো বৃষ্টি। একটানা চার দিন বৃষ্টি আর প্রবল বাতাসে পদ্মার পানি গেল বেড়ে। ক্রমে শুরু হলো প্লাবন। গ্রামের পর গ্রাম তলিয়ে গেল। প্রায় সব কিছুই গেল ভেসে। মানুষ আশ্রয় নিলো গাছের ডালে, ঘরের চালে। দুর্ভিক্ষ কবলিত মৃতপ্রায় মানুষেরাই পড়লো ভয়াবহ বন্যার কবলে। সবার মতো আসগর মিয়াও হারালো সহায়-সম্বল সবই। শুধু প্রাণ নিয়ে নৌকায় ভেসে সপরিবারে সে রওয়ানা হলো অজানার পথে। এমন দুঃসহ যন্ত্রণাময়

জীবনে আসগর মিয়াকে সান্ত্বনা দেয় মালেক। সে স্বপ্ন দেখে অন্য কোন নতুন দেশে ঘর বাঁধার। মনোবল ভেঙে যায় আমিনার। সে অনিশ্চিত যাত্রার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে এবং বলে:

আবার নতুন করে ঘর বাঁধতে হবে নতুন দেশে।[৩৫]

আমিনার বিষাদময় এ বাক্যটিতেই যেন মূর্ত হয়ে ওঠে নদী শিকস্তা মানুষের দুঃখময় জীবনের ছবি। নদী তীরবর্তী মানুষের জীবনে নদী যেন জীবন ও মৃত্যু নিয়ে খেলা করে। নজুমিয়া-আসগর মিয়াদের জীবন সাজায় যে নদী, সেই নদীই আবার ভেঙে ফেলে তাদের সাজানো সংসার। ভাঙাগড়ার বিচিত্র ঘটনার মধ্যে নদীই শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে মহাশক্তিধর, তাদের জীবনের নিয়ন্তা। এ বিষয়ে একজন সমালোচক বলেছেন :

> 'পদ্মানদীর মাঝি'র কুবের, কপিলা, মালার মত নজুমিয়া, আসগর, কুলসুমেরও পদ্মার সঙ্গে নিয়ত লুকোচুরি খেলা, ভাঙাগড়ার প্রতিনিয়ত এক সংগ্রাম এবং পরিশেষে এক স্বপ্নের সোনালী দ্বীপে আশ্রয়ের আশ্বাস।[৩৬]

কিন্তু জীবন তো থেমে থাকে না। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সূচিত হয় পরিবর্তন প্রকৃতিতে ও মানুষের জীবনে। সে দিনের বিপন্ন মালেকের জীবনেও আসে নতুন দিন, সাফল্যের দিন। পৈত্রিক সূত্রেই মালেক নদী তীরবাসী। পিতা নজুমিয়ার মতো সে-ও বিরুদ্ধ পরিবেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে রচনা করে নিজ ভাগ্য। সাহসী ও সংগ্রামী মালেকের জীবনে সাফল্যের আভাস পাওয়া গিয়েছিল কৈশোরে কুমির ধরা প্রসঙ্গে তার দাদী আয়েষার মন্তব্যে। মালেকও তার বাবা নজুমিয়ার মতো সাফল্যের দিন নদী তীরে এসে দাঁড়ায়। আত্মতৃপ্ত মালেক তাকিয়ে থাকে শান্ত নদীর দিকে। নদীর সঙ্গে তাদের জীবন বাঁধা, মেজাজ-মর্জিও বাঁধা। নদীর শান্ত স্বভাবের তলে যে লুকিয়ে থাকে তার জীবন বিনাশী ভয়ঙ্কর রূপ, তা নদী সম্পর্কে অজ্ঞ মানুষের পক্ষে কল্পনা করাই কঠিন। যারা বাঁচে নদী সম্পৃক্ত হয়ে, তারা জীবন মৃত্যুর ঐ খেলার অধীন হয়েই বাঁচে। ধ্বংস ও মৃত্যুকে ভয় করলে তাদের চলে না। নজুমিয়া, আসগর মিয়া, মালেক সবাই তাই একই পথের পথিক। একই যুদ্ধের সৈনিক। জীবন তাদের কারও জন্যে তৈরি করে না অনুকূল কোন স্রোত। বিয়ানচরের নতুন জমি চাষ উপযোগী করে গড়ে তুলতে আসগরের মনে পড়ে অতীত দিনের স্মৃতি। প্রথম যৌবনের উদ্যামে বন্ধু নজুমিয়াকে নিয়ে হাড়-ভাঙা খাটুনি করে চরের জমি আবাদ করেছে আসগর মিয়া। সে দিনের সে সাহস, সে উদ্যম আজ আর নেই। তবু জীবনের তাগিদে একটু ঠাঁই গড়ে তুলতে আসগর মিয়া প্রচেষ্টারত। তার সঙ্গে রয়েছে নবীন যুবা কর্মঠ মালেক। মালেক আসগরের সঙ্গে তার সবটুকু সামর্থ্য ঢেলে দিয়ে কাজ করেছে।

আসগর মিয়া তার পুত্রতুল্য মালেকের সহায়তায় কঠিন পরিশ্রম ও সুকৌশলে বিয়ানচরে বিস্তার করে আধিপত্য। তার সাফল্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। পুরনো দিনের কোন কোন পরিচিত মানুষ এসেছে বিয়ানচরে বসবাস করার জন্যে। আসগর মিয়ার এ সাফল্যের সময় নূরুর মা আমিনা উপস্থিত নেই। সে দুর্ভিক্ষের পর রোগাক্রান্ত হয়ে মারা গেছে। ফলে আমিনার অনুপস্থিতিতে সাংসারিক কাজের দায়িত্ব নেয় নূরু। সে দক্ষতার সঙ্গে সংসারের সব কাজ কর্ম সামলাতে থাকে। সুখেই কাটে আসগর, মালেক ও নূরুর জীবন। সময়ের ব্যবধানে নূরু আর আগের মতো ছোট নেই; সে এসে দাঁড়িয়েছে বয়োঃসন্ধিক্ষণে। যৌবনের ঊষা লগ্নে নূরুর মধ্যে মন উচাটন ভাব লক্ষ্য করে বিপাকে পড়ে মালেক। নূরুর অভ্যস্ত আচার-আচারণের পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে মালেকের মধ্যেও জেগে ওঠে কৌতূহল। সে বিনা কারণে হাসে, বিনা কারণেই মন খারাপ করে, গুনগুনিয়ে গানের সুর ভাঁজে। লাজ-নম্র মেয়ে নূরু নক্‌শী কাঁথায় রঙিন সুতোয় ছবি আঁকে। সে ছবিতে যেন মালেকের মুখই ফুটে ওঠে। নূরুর মনোভাবে মালেকও হয় তার প্রতি মুগ্ধ, অনুপ্রাণিত। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> এ যে তার বিয়ের কাঁথা—ফুল শয্যার রাতে-- নতুন বর বধূর বিছানায় ফুলকাটা রঙীন নকসী কাঁথা বিছিয়ে দেয়, আর সেই কাঁথা বধূকে নিজের হাতে সেলাই করতে হয়।[৩৭]

রহিমপুর বসবাসের সময় থেকেই নূরু ও মালেক পরস্পরের প্রতি মমতা পোষণ করে আসছে। তারা একই সংসারে বড় হয়ে উঠেছে। নানা সূত্রে তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে সাধারণ শোভন নৈকট্য। তাদের বাল্য-কৈশোরের ভালো লাগা যৌবনে এসে যেন ভালোবাসায় রূপ নিয়েছে। তারা আর আগের মতো সহজে যেন মিশতে পারে না পরস্পরের সঙ্গে। এরই মধ্যে একদিন দেখা গেল মালেক ধানের ছড়ায় গাথাঁ একটি মালা গলায় পরিয়ে দিচ্ছে নূরুর গলায়, এক জায়গায় একান্তে দেখা করতে এসে। এ চিত্রটি ঔপন্যাসিক উল্লেখ করেছেন নিম্নরূপে :

> নূরু মাথা নীচু করে দাঁড়াল, মালেক যত্নে তার গলায় হার পারিয়ে দিল। নূরু নত হয়ে তাকে সালাম করল কিন্তু মালেক তাকে ধরবার আগেই লঘু পায়ে পালিয়ে গেল। দরজার পাশে গিয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়াল, তার চোখমুখ হাসিতে উজ্জ্বল।[৩৮]

গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে নিষ্পাপ গ্রাম্য তরুণ তরুণীর অকৃত্রিম অনুরাগের চিত্রই এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। মালেক ও নূরুর এই নব অনুরাগ যে আনন্দের আয়োজন করে তার মাধুর্যে আসগর মিয়ার প্রাত্যহিক সংসার জীবন যেন আরও সাবলীল ও মধুময় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এই আনন্দের বাস্তবতা আসগর মিয়া গ্রহণ করতে উৎসুক নন। তাদের সম্পর্ক ভাই-বোনের অতিরিক্ত কিছু বলে সে মনে করে না। আসগর মিয়ার এই ভাবনার অন্তরালে অকাট্য কোন যুক্তি থাকলেও মালেক ও নূরুর কাছে তা

অজানা। সে কারণে তারা পরস্পরের প্রতি আরও আকৃষ্ট হতে অনাগ্রহী হয় নি। ইতোমধ্যে মালেকের জীবনে নেমে এলো এক দুঃখময় অধ্যায়। সে অপহৃত হলো জলদস্যুদের দ্বারা। একদিন বাইরের জমি-জমার কাজ সেরে প্রতিদিনের মতো মালেক বাড়ি ফিরছে না। আসগর, নূরু সবাই চিন্তিত। ক্রমে রাত বাড়ে; তবু মালেক বাড়ি ফিরছে না। অবশেষে সবাই তাকে খুঁজতে বেরিয়েছে। ঘটনার এ পর্যায়ে মঞ্চে আবিভূর্ত হয় আজিজ। সে দুর্ভিক্ষের পরবর্তী বন্যায় দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তার স্ত্রী কুলসুম কন্যা সন্তান প্রসবকালে মৃত্যু বরণ করে। তারপর ছেলে দুটোও মার যায় অসুখে। সবাইকে হারালেও আজিজ পদ্মার বলয়ের বাইরে যেতে পারে নি। কিন্তু জীবনের বার বার নিষ্ঠুর আঘাতে সে যেন হয়ে যায় পাগলপারা। ঘটনার আবর্তে সে আবার ফিরে আসে বিয়ানচরে। নদী যেন তার কোমরে বেঁধে রেখেছিল এক অদৃশ্য সুতো। তারই টানে আজিজ যেন ফিরে আসে নদীরই কবলে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও মালেকের কোন খবর সংগ্রহ করা যায় নি। চিন্তিত আসগর বিভিন্ন দিকে দলে দলে লোক পাঠায় মালেককে খুঁজতে। আসগর মিয়া নিজেও অনেক চেষ্টা করে তার কোন সন্ধান পায় নি। আসগর মিয়া গভীর বিষাদে নিপতিত পুত্রতুল্য মালেককে হারিয়ে। কন্যা নূরুর মুখ শুকিয়ে যেন চৌচির। তার খাওয়া-দাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেছে, পড়ে আছে সে অজ্ঞান হয়ে; মালেকের অনুপস্থিতিতে শোকের ছায়া নেমেছে বিয়ানচরে। দিনের পর দিন অপেক্ষায় রয়েছে তারা মালেকের জন্যে। আসগরেরও ভেঙে গেছে মন, কিন্তু মেয়েটির ভাঙা মনে সাহস যোগাতে প্রতিদিন সে আজিজকে নিয়ে টিলায় যায়। টিলায় যেতে যেতেই আজিজ আসগর মিয়ার সঙ্গে মালেক ও নূরুর প্রেম সম্পর্কে কথা তোলে। কিন্তু মালেক ও নূরুর সম্পর্ক ভাই-বোনের। এর অধিক বলে কোন সম্পর্ক বিবেচনা করতে পারে না আসগর মিয়া। আসগর মিয়া মলেক ও নূরুর প্রেমের সম্পর্ককে মানতে না চাওয়ার মধ্যেই রয়েছে যেন এক গোপন সত্য। শেষ পর্যন্ত একদিন মালেক ফিরে আসে জেলেদের নৌকোয় চড়ে। নৌকা থেকে নেমে এলে আসগর মিয়ার সব দুঃখ যেন হয় অন্তর্হিত। মালেকের অনুপস্থিতিতে বিয়ানচরের মানুষের মনে যেমন নেমেছিলো শোকের ছায়া, তার ফিরে আসায় তাদের মনে তেমনই জেগেছে আনন্দের ধারা। আসগর মিয়া গ্রামের মানুষদের দাওয়াত দিয়ে জেয়াফত খাওয়ানোর ব্যবস্থা করে :

> পুরুষ্ট দেখে একটা বাছুর জবাই করে কালিয়া আর কবাবের আয়োজন হল, সমুদ্রের রকম বেরকমের মাছ ভেজে তাতে শুকনা লঙ্কা কাঁচা মরিচের বাটনা বেটে নানা রকমের ঝালঝোল অম্বল তৈরী হল।[৩৯]

উৎসবের আনন্দে আহারাদি সেরে সবাই মালেকের নিখোঁজ হওয়ার প্রকৃত কারণ জানতে চাইল। জানা গেল, মংপু জলদস্যুদের কবলে পড়েছিল মালেক। দস্যুদের সঙ্গে

মালেক চতুর ও সাহসী আচরণ করে বিয়ানচরের মানুষদের রক্ষা করেছে ডাকাতের কবল থেকে। ডাকাতদের সে মিথ্যা তথ্য দিয়ে তাদের বিভ্রান্ত করেছে। মালেক তাদের জানিয়ে দিয়েছিলো, পঞ্চায়েত শক্তিশালী এবং ভয়ানক হিংস্র চরিত্রের। সে কারণেই হয়তো তারা অতি ভয়ে এ বিয়ানচরে হামলা চালিয়ে লুট-তরাজ করতে আসে নি। সে সময় জলদস্যুরা নদী তীরবর্তী লোকালয়ে হামলা চালিয়ে ধন-সম্পদ লুঠ করত এবং মেয়েদের সম্ভ্রমহানি করত। এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন :

> হার্মাদের হাতে মালেকের বন্দী হওয়া নিম্ন বঙ্গের এক নিমর্ম উপদ্রবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়. সে মোগল আমল থেকে পর্তূগিজ আর আরাকান বা মগ জলদস্যুদের আক্রমণে নিম্ন বঙ্গের মানুষ বারবার নিপীড়িত হয়েছে, বহু জনপদ তাদের লুণ্ঠন আর অপহরণে বিরাণ হয়ে গেছে, কোম্পানির আমলেও জলদস্যুদের উৎখাত শেষ হয় নি। মহারানী ভিক্টোরিয়া এ দেশ শাসনভার সরাসরি বৃটিশ সরকারের হাতে গ্রহণ করার পরেও জলদস্যুদের অত্যাচার কমে নি। নিম্ন বঙ্গের মানুষের সেই দুর্ভাগ্যের কথা 'নদী ও নারী' উপন্যাসে রয়েছে।[৪০]

জেলেদের জন্যেই মালেক দস্যুদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। ঝড়ের কবলে দস্যুদের নৌকা ডুবে যাওয়ার অবস্থা লক্ষ্য করেছিলো জেলেরা। জেলেরা তাদের স্বভাবমত নদীতে বিপদগ্রস্ত নৌকা ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে এসেছিল ; কিন্তু, দস্যুদের কাছে সে উদ্যোগ গ্রহণযোগ্য হয় নি। সে কারণে, তারা তাদের স্বভাবসুলভ হিংস্রতায় জেলেদের আক্রমণ করে। কিন্তু জেলেরা সংখ্যায় বেশি থাকায় এবং ঝড়-তুফানে নদীতে লড়াই করে টিকে থাকার যোগ্যতা ডাকাতদের চেয়ে জেলেদেরই বেশি থাকায় ডাকাতরা সুবিধে করতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত ডাকাতরাই ধরা পড়ে জেলেদের হাতে এবং নৌকার ভেতর থেকে জেলেরা মালেককে উদ্ধার করে বিয়ানচরে টিলার ওপরে পৌঁছে দেয়। আসগর মিয়া জেলেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জিয়াফতে দাওয়াত দিয়েছে তাদেরও; এমন কি, তাদের নানা উপহার দিয়ে সম্মানিতও করেছে। এ প্রসঙ্গে উপন্যাসে বলা হয়েছে :

> নতুন ধানের চিড়ে, নতুন গুড়ের পাটালি, সবার জন্য আনকোড়া কাপড় আর জেলের সর্দ্দারের বউয়ের জন্য ছাপাপেড়ে শাড়ী, আরশী, কাঁকন, পুঁতির মালা।[৪১]

এ সব সামগ্রী উপহার প্রদানে আসগর মিয়ার কৃতজ্ঞ মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সবের মধ্য দিয়ে অবশেষে বিয়ানচরের মানুষের মধ্যে নেমে আসে শান্তি, মালেকের অভাবে উদ্বিগ্ন সবাই হয় শান্ত। কিন্তু অশান্ত হয়ে ওঠে মালেকের মন। সে আজিজের মাধ্যমে জেনেছে, নূরুর প্রতি তার ভালোবাসা প্রতিষ্ঠা পাবে না কোনদিন। শৈশব থেকে যৌবন অবধি যে দুজন মানুষের ভালোবাসায় লালিত হাজারো স্বপ্ন, অনিবার্যভাবে তাদের ভুলে যেতে হবে প্রেম ও প্রণয় প্রত্যাশা। এমন এক কঠিন সত্যের

মুখোমুখি মালেক ও নূরুকে উপস্থিত করেছে আসগর মিয়া। আসগর মিয়ার যৌবনকালের বন্ধু নজুমিয়া আসগরের সঙ্গে করেছিলো বিশ্বাসঘাতকতা। আসগর মিয়া তার আত্মীয় আমিনাকে ভালোবাসতো, এ কথা নজুমিয়াও জানত। এ সত্য জেনেও সে আমিনাকে বিয়ে করার ব্যবস্থা পাকা করে প্রশাসন ও আমিনার মায়ের অর্থ-সম্পত্তির লোভ কাজে লাগিয়ে। নজুমিয়া ও আমিনার সে সংসারের সন্তান মালেক। এক পর্যায়ে নজুমিয়া সন্তান মালেককে রেখে আমিনাকে তাড়িয়ে পাঠিয়ে দেয় বাপের বাড়ি। এর কারণ হিসাবে নজুমিয়া অপবাদ দিয়ে বলেছে যে, আমিনা ও আসগর মিয়ার মধ্যে সম্পর্ক তখনও অব্যাহত। মিথ্যা কলঙ্কের বোঝা নিয়ে আমিনা এসে দাঁড়ায় নিতান্তই অসহায় হয়ে। সে সময় অসহায় এ নারীর প্রতি একদিকে মানবিক অন্যদিকে পূর্ব প্রেমিকার জন্যে স্বাভাবিক আকর্ষণের কারণে আমিনাকে বিয়ে করে আসগর। আসগর ও আমিনার এ সংসারে জন্ম হয় নূরুর। এই জন্মসূত্রে মালেক ও নূরু একই মায়ের সন্তান। জীবন-বিড়ম্বিত এই নারীকে আসগর মিয়া দিয়েছে সামাজিক প্রতিষ্ঠা। সময়ের বিবর্তনে অনেক ভাঙা-গড়ার মধ্য দিয়ে কাহিনী এখানে এসে পৌঁছেছে। মালেক ও নূরু আসগর মিয়ার মুখ থেকে অতীতের এই ইতিহাস জেনে স্তব্ধ হয়ে গেছে গভীর বেদনায়। 'নদী ও নারী' উপন্যাসে প্রেমের মাধুর্যকে লেখক শেষ পর্যন্ত যেন ভরে দিয়েছেন তীব্র বিষে। প্রেমের এই অস্বাভাবিক উপস্থাপনার মধ্যে এক ধরনের প্রতীকী ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করা যায়। নদীর ভাঙা-গড়ার কবলে পড়ে জীবনের ওলট-পালট হওয়া শুধু বৈষয়িক ক্ষতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, হৃদয়বৃত্তিও যেন সেখানে হয় বিপর্যস্ত। বেদনার্ত, বিধ্বস্ত একটি মন নিয়ে মালেক আসগর মিয়ার আশ্রয় ছেড়ে চলে যায় দূরে, অজানার পথে। বুকভরা আশা তার পাথেয়। এক নিষ্ঠুর সত্যকে নিরবেই সইতে হলো তিনজনকে। আসগর নূরুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে :

> নদীর বুকের মানুষ আমরা—জল আর কাদার সঙ্গে আমাদের কারবার। বালু চরের উপর ঘর বাঁধি, নদীর স্রোতে সে ঘর বার বার ধুয়ে মুছে ভেসে যায়। তবু আমরা হার মানি না, নতুন করে আবার ঘর বাঁধি। অ-ভাঙা জমিকে আবাদ করি, ভাঙা জমির বুকে ফলাই সোনার ফসল। নদী যতবার সব ভেঙে ফেলে, ততবার আমরা নতুন করে গড়ি।[৪২]

মালেক যেন সর্বস্বান্ত। তাকে আসগর মিয়া ও নূরুর সাহচর্য ত্যাগ করতেই হবে। প্রকৃতপক্ষে, মালেকের এই চলে যাওয়া মন থেকে আসগর মিয়া ও নূরু কেউ-ই সমর্থন করে না। কিন্তু উপস্থিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ পরিস্থিতির বাস্তবতা মালেককে চলে যেতে বাধ্য করে যেন, তাই নিরব, ভাষাহীন, আসগর মিয়া ও নূরু। মালেক চলে যেতে যেতে প্রত্যয়দীপ্ত হয়ে ওঠে, ভাবে নতুন করে গড়ে নেবে তার জীবন। অসহায় আসগর মালেকের এই বিদায়কে উৎসাহিত করে নিজেকে প্রবোধ দিয়ে, মানুষের জীবনের ভাঙাগড়া নদীর ভাঙা-গড়ার সঙ্গে সমান্তরাল বিবেচনা করে বলে :

> নদীর ধারা বদলাবেই। এ পাড় ভাঙলে ও পাড় গড়বে। পুরানো খাদ ছেড়ে নতুন খাদ খুঁজবে–নদীর রীতিই এই। কিন্তু তবু পুরানো খাদকে ভোলে না নদী–বার বার পুরানো খাদে ফিরে আসে।[৪৩]

মানুষও নদীর মতো ভাঙা-গড়ার মুখোমুখি হয় কখনও কখনও, জীবন কখনই একই রকম কুসুমাস্তীর্ণ পথে চলে না, সে মাঝেমাঝেই হয় কণ্টকাকীর্ণ। নদীর গতি পরিবর্তনের মতো মানুষের জীবনেরও ঘটে পট পরিবর্তন। তেমনই পট পরিবর্তনের মাধ্যমে মালেক ভুলুক তার জীবনের গভীর দুঃখ। নদী যেমন ঘুরে ফিরে আসবে আবার তার নিজ জীবনের প্রতিষ্ঠার ধারায়, এ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে অজানার পথে বের হয় মালেক।

নদী ও নারী উপন্যাসে নদী তীরবর্তী সংগ্রামী জনগণের যে জীবনছবি পাওয়া যায়, তা পদ্মানদীকে কেন্দ্র করে তার তীরে গড়ে ওঠা দরিদ্র মুসলিম সমাজের। নদীর ভাঙা-গড়ার সঙ্গে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ গাঁথা। পদ্মার বিচিত্র আচরণের অধীন তারা। তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যেও থাকে দুঃসাহস-দৃঢ়তা, কঠিনে-কোমলে মিলিত মানবিক সত্তা। নজুমিয়া, আসগর ও মালেকের জীবনদৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে উপন্যাসের মূলপাঠ। নজুমিয়া ও আসগরের জীবন-স্বপ্নের ধারক-বাহক মালেক।

পদ্মাতীরে নজুমিয়ার অন্তর্কথনে প্রকাশিত হয়েছে পদ্মা তীরবর্তী সংগ্রামী জীবনের রূপ।নজুমিয়া ও আসগর বন্ধু ও একই পর্যায়ভুক্ত জীবনসংগ্রামী হলেও তারা জীবন ভাবনায় ছিল ভিন্নধর্মী। নজুমিয়া জীবন সাফল্যের মধ্যবর্তী সময় মারা যায়, অন্যদিকে আসগর উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত উপস্থিত ছিল। ফলে আসগরের জীবনে সফলতা-ব্যর্থতাও ছিল। তার জীবনে অচরিতার্থতার বেদনা আসে মালেক ও নূরুর ভুল প্রেমের ঘটনায়। একই মায়ের গর্ভজাত দুই পিতার সন্তান মালেক ও নূরু। এই তথ্য প্রকাশ হয় উপন্যাসের শেষে, সঙ্গে সঙ্গে মালেক ও নূরুর গভীর প্রেমের পরিণাম নিশ্চিত হয়। মালেক নূরু ও আসগরকে ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। এক অজানা পথে পা বাড়ায় মালেক। সে অনিশ্চিত যাত্রা মালেকের নতুন করে বেঁচে থাকার আশাকে স্তব্ধ করতে পারে না; তা-ই যেন নদী তীরবর্তী, সংগ্রামী জীবনসত্তার প্রতীক। গভীর সংকট আর দ্বন্দ্ব-মুখরিত জীবনে বেঁচে থাকার আকুল আশায় পথ চলা নদীমাতৃক বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামী জীবন-ছবির অসাধারণ দলিল *নদী ও নারী* উপন্যাস। একজন সমালোচক বলেছেন :

> হুমায়ুন কবিরের বুর্জোয়া মানবতাবাদী জীবনচেতনার সঙ্গে মৃত্তিকামূলস্পর্শী শিল্প-অন্বেষার সঙ্গতি 'নদী ও নারী' উপন্যাসকে বৃহত্তর জনজীবনের মহাকাব্যিক শিল্পরূপে পরিণত করেছে।[৪৪]

তথ্যনির্দেশ :

১. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রসঙ্গ: কথাসাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১২
২. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ২৮
৩. বিশ্বজিৎ ঘোষ, বাংলাদেশের সাহিত্য, ঢাকা, ১৯৯১, পৃ. ৫
৪. হুমায়ুন কবির, নদী ও নারী, ঢাকা ও কলকাতা, ১৯৪৫, পৃ. ৭
৫. রফিকুল ইসলাম, হুমায়ূন কবিরের 'নদী ও নারী' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অনাদৃত রত্ন, উত্তরাধিকার, ১৯৮৫, পৃ. ১৩৬
৬. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৭. ঐ, পৃ. ১০
৮. রফিকুল ইসলাম, হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' উপন্যাস সাহিত্যের অনাদৃত রত্ন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৯. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২
১০. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫
১১. ঐ, পৃ. ৩৫
১২. ঐ, পৃ. ৭
১৩. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
১৪. ঐ, পৃ. ৬৯
১৫. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭০
১৬. ঐ, পৃ. ৭৩
১৭. ঐ, পৃ. ৭৫
১৮. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
১৯. ঐ, পৃ. ৯৪
২০. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬
২১. ঐ, পৃ. ৯৮
২২. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২১
২৩. ঐ, পৃ. ১২১
২৪. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯
২৫. ঐ, পৃ. ১৩৩
২৬. ঐ, পৃ. ১৩৫
২৭. ঐ, পৃ. ১৪৯
২৮. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭
২৯. ঐ, পৃ. ১৬৬
৩০. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪
৩১. ঐ, পৃ. ১৮৩

৩২. ঐ, পৃ. ১৮৬
৩৩. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮
৩৪. ঐ, পৃ. ১৮৮
৩৫. ঐ, পৃ. ১৯২
৩৬. অরূপ কুমার ভট্টাচার্য, আঞ্চলিকতা : বাঙলা উপন্যাস, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ. ৭২
৩৭. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৪
৩৮. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১১
৩৯. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪২
৪০. রফিকুল ইসলাম, হুমায়ুন কবিরের 'নদী ও নারী' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের অনাদৃত রত্ন', পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৬
৪১. হুমায়ুন কবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭২
৪২. ঐ, পৃ. ২৯৫
৪৩. হুমায়ূন কবির, নদী ও নারী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯৬
৪৪. রফিকউল্লাহ খান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯